সিকোয়েল

সপ্তাহান্তে মেয়ের ফোন আসে। নিশ্চিন্ত আরামে সারা সপ্তাহের খুঁটি নাটি খবরের আদান প্রদান চলে ঘণ্টাভোর ধরে। তারই ফাঁকে চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে ফেলি কথাটা। বলে হালকা হই।

"শোন, একটা হেট মেল এসেছে।"

"ওমা তাই! বলোনি তো এতক্ষণ! কবে এলো? কি বলেছে?"

"বলেছে প্রগতি গল্পটা লেখা উচিত হয়নি আমার। অমন গ্রাফিক ডিটেইলে মেয়েদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে গল্প ভবিষ্যতে আর কক্ষণো যেন না লিখি।"

"বা রে! মেয়েদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা তো খবরের কাগজে প্রতিদিনই বেরোচ্ছে। গ্রাফিক ডিটেলেই শুধু নয়, নাম ঠিকানা ফটো সুদ্ধু ছাপছে সত্যি ঘটনাগুলো। আর তুমি একটা গল্প লিখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?"

"তা জানি না। তবে আমাকে ওরকম গল্প আর লিখতে মানা করেছে।"

"কোথায় বেরিয়েছে গল্পটা?

"অভিবাসী বাঙ্গালীদের একটা ওয়েব ম্যাগাজিনে।"

"তাদের বলুক গিয়ে।"

"ভাবছি আমি তাদের একটা হালকা ধরনের গল্প পাঠাবো। আগের গল্পটা পাল্টে দেয় যাতে।"

"কেন মা? একটা হেট মেল পেয়েই ভয় পেয়ে গেলে? বড় বড় লেখকরা অমন কত উদ্‌ভট্‌ চিঠি পায়, ফতোয়া পায়। ভয় পেলে চলে? সলমান রাশ্‌দিকে দ্যাখো।"

"সে বেচারা তো প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরছে এখন। তবে আমাকে সে রকম ঢালাও ফতোয়া জারি করেনি। শুধু এরকম হিংসাত্মক গল্প ভবিষ্যতে লিখতে মানা করেছে ----।"

আমি হেট-মেল পেয়েছি সে খবর ক্রমে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় পরিজন সবার মধ্যে চাউড় হয়ে গেল। সবাই এক বাক্যে বললো লেখক হতে গেলে হেট-মেল এড়ানো যায় না। নামকরা লেখকরা এ সব পেয়েই থাকে। সলমান রাশ্‌দিকে দ্যাখো।

আমি দোটানার মধ্যে রয়েছি। শেষে গল্পের স্টক হাঁতড়ে একটা মানানসই গল্প উক্ত ওয়েব ম্যাগাজিনে পাঠালাম। ইন্টারনেটে প্রাপ্তি সংবাদ ও ধন্যবাদ এসে গেল পাঠানোর সাথে সাথেই। তবে তাদের ওয়েব ম্যাগাজিনে 'প্রগতি' বহাল রইলো পাক্কা তিন বছর। সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন আজও হয়নি। কে জানে, হয়তো তাদের কাছেও হেট-মেল গেছিল "এ ধরণের গল্প ওয়েব ম্যাগাজিনে যেন আর কক্ষণো না রাখা হয়", এবং সেই ফতোয়ার প্রতিবাদেই 'প্রগতি' গল্পটা অমন সুদীর্ঘকাল তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় বহাল রেখেছিলেন।

যা হোক, এসব অনেক পরের কথা। হেট-মেল পাওয়ার উত্তেজনা পুরো থিতিয়ে যাওয়ার আগেই আমার স্বামীর চিরাচরিত যুক্তিপূর্ণ আচরণ সব মজা ভেস্তে দিল। স্বামী উক্ত ওয়েবজিনের পুরোনো দলিলপত্র ঘেঁটে আসল তথ্য উদ্‌ঘাটন করলেন। প্রমাণ মাপের হেট-মেল নয়, ফতোয়া নয়। লেখক

হিসাবে আমার জাতে ওঠার কোন নিদর্শন নয়। স্রেফ অন্তর্দাহ প্ররোচিত অতি শস্তা ভাঙ্‌চি জাতীয় চিঠি। পত্রপ্রেরকের কয়েক টুকরো লেখা -- ধাঁধা, ছড়া, চুটকুলা-- ওয়েবজিনে ছিল বেশ কিছুকাল। আমার মারখুট্টে গল্পটা সেই লেখাগুলো হটিয়ে স্থান পেয়েছে ওয়েবজিনে।

আমার মেয়ে বুদ্ধিমতী। এরপর ফোনে ঘুণাক্ষরেও তথাকথিত হেট-মেলের উল্লেখ করেনি আর। সহানুভূতিশীল বন্ধুরাও বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

****

অনেকগুলো বছর নির্বিঘ্নে কেটে যাবার পর আবার হেট-মেল। উৎসাহী পাঠক আমার ওয়েবসাইটের হদিশ পেয়ে উৎফুল্ল মনে ডুব দিয়ে আকণ্ঠ পান করছিলেন সাহিত্যসুধা। কিন্তু এ কি? এত বেদনাময় দৃশ্যপট কেন? "পাঠকেরা গল্প পড়ে আনন্দ লাভের জন্যে। দুঃখের গল্প পড়ে পয়সা উশুল তো হলই না উল্টে মনটা ভার হয়ে রইলো কতদিন ধরে।" (পয়সা উশুল মানে? ফ্রি'তে ওয়েবসাইট থেকে সেরা যত গল্প পড়ে একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ'ও নয়, উল্টে ----)

"পাঠকের সময়ের একটা ভ্যালু আছে। ওই সব কাঁদুনে গল্প পড়ে শুধু পড়ার সময়টুকুই নষ্ট নয়, সারা মন মেজাজ খিঁচড়ে যায়। 'প্রতিদ্বন্দী' গল্পে মুরলীর মত মেধাবী ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিয়ে লোকের বাড়ি চাকরের কাজে লাগিয়ে লেখিকা কি পেলেন? অনায়াসে সুন্দর সফল একটা জীবন দেওয়া যেতো তাকে। পড়ে দিল্ খুশ হত পাঠকের। হিন্দী সিনেমা দেখে যেমন হয়।" (তাই দ্যাখ না বাপু। কে বলেছে ওয়েবসাইট খুলে আমার লেখার পিণ্ডি চটকাতে?)

ছেলে সফ্‌ট্ ওয়্যার দিগগ্‌জ। বিশ্বের সেরা সংস্থাগুলোর জন্যে সফ্‌ট্ ওয়্যার বানায়, দারুণ হাশ্ হাশ্ কাজ। অবিশ্বাস্য ক্ষমতা সে সব সফ্‌ট্ ওয়্যারের।

বললাম, "হ্যাঁরে, এমন কিছু বানাতে পারিস না যাতে আমার লেখা সম্বন্ধে যাদের বিতিকিচ্ছিরি চিন্তাধারা, তারা আমার ওয়েবসাইট খুলতেই পারবে না। মাউস নিয়ে যতই ক্লিক করতে থাকুক প্রতিবার স্ক্রীনে একই বাণী ফুটে উঠবে, 'দিস সাইট ক্যান্ নট বি ডিসপ্লেইড'।"

ছেলে হেসে বললো, "থটরিডিং জানে এমন কম্প্যুটারের কথা বলছো তো? আর কিছুদিন সবুর করো, তাও হবে।"

কিন্তু কতদিন সবুর করবো?এদিকে পত্রাঘাতের হার যে বেড়েই চলেছে! "লেখিকা শ্রীমতী ---- , আপনার কি মায়া দয়া বলিয়া কিছুই নাই? কলমের এক আঁচড়ে 'অকাল বৃষ্টি' গল্পের কিশোরী মেয়েটিকে অমন নৃশংস মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দিলেন। কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিল মেয়েটি?"

"কর্মজীবন হইতে অবসর পাওয়ার পর চিত্তবিনোদনের জন্য কম্প্যুটার কিনিলাম। আপনার ওয়েবসাইট পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম বেশ কিছুদিন সাহিত্যচর্চা করিয়া কাটাইবো। ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"---- আপনি কলমে শব্দের জাল বুনিয়া আপনার গল্পের পাত্র পাত্রীদের জন্য যত ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি করিয়াছেন। একবারও কি ভাবিয়াছেন পাঠকদের মনের উপর কি প্রভাব পড়িতে পারে? বিশেষত বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা অধিকাংশই প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধের পর্যায়ে পড়েন। ইহাদের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠদের বাংলা বই পড়িবার অবকাশ বা ঝোঁক নাই। অনেকের বাংলা ভাষার অক্ষরজ্ঞানও নাই। বাঙালী পাঠকদের বয়সের কথা চিন্তা করিয়াই বোধহয় আপনি ওয়েবসাইটে বড়

বড় হরফের ব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য আপনি নিঃসন্দেহে উক্ত পাঠকবর্গের প্রশংসার্হ। কিন্তু কি লাভ হইল? আপনার গল্পগুলি পাঠ করিলে চেঙ্গিজ্ খাঁ, নাদির শা, পোলপট, হিটলার এবং আরও যত নিষ্ঠুর চরিত্র এ যাবৎ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিয়াছে তাহাদের ছবি মানসচক্ষে ভাসিয়া ওঠে। আজিকার জগতে তাহাদের সমতুল্য কার্যকলাপে লিপ্ত হইবার সুযোগ নাই। সে কারণেই কি আপনি রাজ্যের হিংস্রতাপূর্ণ কাহিনী লিখিয়া মনোগত বাসনা চরিতার্থ করিতেছেন?"

"বাপ রে! এগুলি কি গল্প, না হাওয়াইয়ান পান্চ্ (বিঃ দ্রঃ "পান্চ্" শব্দটি পানীয় নয়, মূল অর্থে ব্যবহার করিয়াছি)। আপনার এক একটি গল্পের মুষ্ঠাঘাত কাটাইয়া উঠিতে কতখানি সময় লাগে কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সারাজীবন ধরিয়া নানান হ্যাপা সামাল দিবার পর অবসরপ্রাপ্ত এই মানুষগুলি এখন একটুখানি সুখ-শান্তি-সোয়াস্তির প্রত্যাশী। আপনার গল্প পড়িবার পর পাঠকের মনে সুখ-শান্তি-সোয়াস্তির ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না। মন নিদারুণ বিষাদে ভরিয়া যায়। আপনি যদি ভাবিয়া থাকেন এই ক্রুর নিন্দনীয় gimmick দ্বারা জনপ্রিয় হইবেন, তবে ভুল ভাবিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক পিটুলি-গোলা আর খাঁটি দুধের পার্থক্য বোঝে।"

এরপর আর কালক্ষেপ নয়। ওয়েবসাইটের সবকটা গল্পের শেষে "ক্রমশ" লাগিয়ে সিকোয়েল লিখতে বসে গেলাম। "প্রতিদ্বন্দ্বী"র শেষাংশ আগামী সপ্তাহেই দেখতে পাবেন। মুরলী পড়াশোনায় ইতি দিয়ে চাকরের কাজ ধরেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা মনিবগিন্নীর ফরমাস মত জিনিসপাতি কিনে ফেরার পথে একটা টাকার ব্যাগ কুড়িয়ে পায় এবং ব্যাগে খোদাই করা নাম ঠিকানা দেখে মালিককে সেটা ফেরৎ দিতে যায়।

ব্যাগের মালিক সাবারওয়াল যে সে লোক নয়, এক ধনী শিল্পপতি। গাড়ি থেকে নামার সময় ব্যাগটি কোথাও পড়ে যায়। সেটা ফেরৎ পাবার আশা ত্যাগ করেছিলেন। প্রায় লাখ দেড়েক টাকা দামের রক্তমুখী হীরের অ্যাঙ্টি ও একতাড়া নোটের বান্ডিল ছিল ব্যাগে। প্রায় হাজার তিরিশেকের মত টাকা ছিল বান্ডিলে।

আঙ্টিটা তাঁর গুরুদেব নিজের আশ্রমের বিগ্রহকে উৎসর্গ করে মন্ত্রপুত করার পর মাত্র কদিন আগে হাতে এসেছে তাঁর। গুরুদেবের আশ্রম অনেক দূরে। ট্রেনে যেতে পুরো দু'দিন লেগে যায়। প্লেনে দু'ঘন্টা। কারখানার ডেপুটি ম্যানেজার অশোককে প্লেনেই পাঠিয়েছিলেন সাবারওয়াল। অশোক তাঁর ডান হাত। আংটিটা গুরুদেবকে দিয়ে মন্ত্রপুত করিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় চার দিন লেগেছিল অশোকের। দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল সাবারওয়ালকে। অশোকের উপস্থিতি তাঁর কাছে ঢের বেশী মূল্যবান প্লেন ভাড়ার বাড়তি কয়েক হাজার টাকার চেয়ে।

স্ত্রীর উপরোধে পড়েই আংটিটা ধারণ করেছিলেন সাবারওয়াল, নইলে তিনি নিজে এসব মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাক একেবারেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু গৃহিনী নাছোড়। স্বামীর উপর নাকি নানা গ্রহের কুদৃষ্টি পড়ছে। আসলে স্ত্রীর গোপন ব্যথার কারণটা উনি জানেন। তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে ওদের ঘর আলো করতে একটিও সন্তান এলো না। গোড়ার দিকে ডাক্তার-বদ্যির দোরে ছোটাছুটি করেছেন প্রচুর।কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি জানার পর মন থেকে প্রসঙ্গটা একেবারেই সরিয়ে দিয়েছেন। জন্মগত কোনো ত্রুটির জন্য তাঁর স্ত্রী সন্তানধারণে অক্ষম। স্ত্রীকে অবশ্য সেকথা জানান নি সাবারওয়াল। তিনি জানেন গলদটা স্বামীর।

আংটিটা মাপে একটু ছোট, কেনার সময় বুঝতে পারেননি। বেশীক্ষণ পড়ে থাকতে কষ্ট হয়।

বাড়িতে স্ত্রীর নজর বাঁচিয়ে যখনি পারেন খুলে রাখেন, তবে সে আর কতক্ষণ! সকালে অফিসের গাড়িতে উঠেই ওটা ব্যাগে চালান করে দেন। আবার সন্ধে-রাত্রে বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নামার আগে চট্‌পট্‌ আঙুলে পড়ে নেন আঙ্‌টিটা। ইদানীং কারখানায় কাজের চাপ বেড়েছে। এক শাঁসালো খরিদ্দারকে মাল সাপ্লাই করছেন। অন্য খরিদ্দারদের অত তাড়া নেই। একদিন সময় করে অশোক স্যাঁকড়ার কাছে গিয়ে একটু ঢিলে করে আনবে আংটিটা। কাজটা খু-উ-ব চুপিসারে সারতে হবে।

এবংবিধ পরিকল্পনার মাঝে সেদিন সকালে ব্যাগসুদ্ধু আংটি হারিয়ে সাবারওয়ালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। স্ত্রীকে কি জবাবদিহি করবেন ভেবে কোনও কুলকিনারা পেলেন না। এমন সময় একটা অল্পবয়সী গরীব ছেলে অফিসে এসে ব্যাগটি তাঁর হাতে তুলে দিলো, যেন সাক্ষাৎ দেবশিশু। মন্ত্রপুত হীরের আংটি, টাকার বান্ডিল সব যেমনটি রেখেছিলেন হুবহু তেমনটি আছে, এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি। অথচ ছেলেটির পোশাক-আশাক ও চেহারায় অভাব অনটনের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে।

সাবারওয়াল প্রশ্ন করে মুরলীর বাড়ির অবস্থার কথা জেনে নিলেন এবং তখনি গাড়ি পাঠিয়ে তার বাবাকে আনালেন ও তাকে কারখানায় চাকরি দিলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মুরলীর পড়াশোনার ভার নিলেন এবং এর কিছুকাল পরে মুরলীকে দত্তক নিলেন। মুরলী স্কুলের পড়াশোনা সেরে কলেজে ঢুকলো এবং কলেজ থেকে পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে গেল। এখন সে লেখাপড়া শেষ করে হার্বার্ডে অধ্যাপনা করছে।

****

"অকালবৃষ্টি"র ধর্ষণ ও মৃত্যুর ব্যাপারটা আসলে অন্যরকম। খড়গ্‌ সিং পুলিসের হাতে ধরা পড়ে অপরাধ কবুল করলেও আসলে সে কিন্তু মোটেও কোন অপরাধ (ধর্ষণ বা হত্যা) করেনি। অল্পবয়সী যে স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ সুগন্ধার মৃতদেহ বলে শনাক্ত হয়েছিল, সেটা সুগন্ধার যমজ বোনের মৃতদেহ। সুগন্ধার মা'র যে যমজ মেয়ে জন্মেছিল তা কেউ জানতো না। ধাই একটি বাচ্চাকে আতুর ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে যায় ও পাশের গ্রামের এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বেচে দেয়। সেই মেয়েটি কিছুদিন আগে নিমুনিয়া হয়ে মারা যায়। দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অতর্কিতে ধ্বস নেমে আগে-পিছে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গের লোকজন মাঝপথে দেহটাকে ফেলে রেখে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে কোনরকমে পথ খুঁজে গ্রামে ফিরে যায়। সেই দেহটা দেখতে পেয়ে আর্মি মেসের গোয়ালা পুলিসে খবর দেয় এবং সবাই সেটা সুগন্ধার দেহ বলে ধরে নেয়।

আসলে সুগন্ধার একটি ছেলের সঙ্গে ভাব-সাব ছিল। খড়গ্‌ সিং-এর চেনা ছেলে। সুগন্ধার বাবা-মা মেয়ের জন্য অন্য পাত্র ঠিক করে রেখেছিল। দু'দিন বাদে বিয়ে পাকা হয়ে যেতো। সেই রাতে সুগন্ধাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার বদলে খড়গ্‌ সিং তাকে তার প্রেমিকের কাছে নিয়ে যায়। তারা দু'জন দূরে কোনও শহরে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে চলে যায় কারণ সুগন্ধার জ্ঞাতি গোষ্ঠি তাদের নাগালে পেলে নির্ঘাত মেরে ফেলতো। খড়গ্‌ সিংকে পুলিস যখন "আততায়ী" মনে করে ধরে এনে জেরা করতে লাগলো খড়গ্‌ সিং দেখলো দু'টি নিষ্পাপ প্রেমিক-প্রেমিকাকে পালিয়ে যেতে ও জীবনে সুখী হতে সাহায্য করার এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। তাই পুলিস যখন সুগন্ধাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার অপরাধে খড়্গ সিংকে অভিযুক্ত করলো, সে নির্বিবাদে পুলিসের কথায় সায় দিয়ে গেল। পরে সবাই বুঝলো জ্ঞাতি গোষ্ঠির হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে সুগন্ধা ও তার প্রেমিককে প্রাণে বাঁচাতেই খড়গ্‌

সিং এই নির্দোষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। স্বভাবতই বেকসুর খালাস পেল সে।

****

"পিলিকোঠি" গল্পের পরবর্তী অংশও মোটামুটি তৈরী আছে। মূল কাহিনীটা এই রকম। টুনুদের বাড়ি পিলিকোঠির কাছে হলেও জমিদার বাড়ির সঙ্গে কোনও সামাজিক সম্পর্ক ছিল না পাড়ার কারোই। ছোটবেলায় একবার শুধু জমিদারের ছেলে কুমারকে দেখেছিল টুনু। পাটনা মেডিক্যাল কলেজে সহপাঠি রূপে আবার মিলিত হ'ল তারা। দু'টি হিয়া এক হয়ে গেল। কিন্তু কুমার সাহস করে এ কথা বাবা-মাকে বলতে পারেনি। তাই বাবা-মা'র পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল তার। অদূরে ছাদের আলসেয় বসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে টুনু জমিদারপুত্রের বিয়ের ধুম ধাম সাজ সজ্জা দেখতে দেখতে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলো। প্রাণ গেল না কিন্তু পায়ের হাড়-গোড় এমন ভাবে ভাঙলো যে একটা পা কেটে বাদ দিতে হ'ল। ওদিকে কুমার টুনুকে না পাওয়ার শোকে অর্দ্ধোন্মাদ হয়ে গেল।

গঙ্গায় ঘোর বন্যা এলো। পিলিকোঠির গাড়ি বারান্দায় এক গলা জল। কুমার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো।

এর পরের ঘটনা:- কুমার আসলে মরেনি। মাঝ-দরিয়া থেকে জেলেরা মাছ-ধরা জাল দিয়ে টেনে তুললো তাকে। পড়ার সময় মাথায় চোট লেগে তার মাথার গোলমালও বেমালুম সেরে গেল।

ব্যস অ্যাদ্দুরই লিখেছি। এরপর শুধু টুনুর সঙ্গে কুমারের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে চার হাত এক করা। আর কুমারের বিয়ে করা বউ? সে-ও আসলে তার বাল্য-সখার বাগদত্তা। বাসরঘরেই সে কথা কুমারকে জানিয়েছিল মেয়েটি। সবার নজর বাঁচিয়ে কুমারের হাতে রাখী বেঁধে তাকে রাখীভাই করেছিল। কুমার আর টুনুর বিয়েটা হয়ে গেলে এই মেয়েটিও নিজের বাগদত্ত প্রেমিকের কাছে ফিরে যাবে।

গল্পের একটা জায়গায় আটকে আছে শুধু। সাউথ কোরিয়ার সেই যে কোন বৈজ্ঞানিক - হোয়াং না কি যেন নাম - স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করে খুব খ্যাতিলাভ করেছিল। শোনা গেছিল তার গবেষণার ভিত্তিতে এর পর নাকি স্টেম সেল দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কোনও অংশ যথেচ্ছ মেরামৎ করা যাবে। তারপর কি সব গোলমাল হ'ল। জানা গেল সেই বৈজ্ঞানিক নাকি ধাপ্পাবাজ। আমার ছেলে বলেছে ইন্টারনেট থেকে সঠিক তথ্য বার করে আমায় জানাবে। টুনুর খোঁড়া পা জোড়া দিতে পারলে গল্পটা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'বে।

আরও তেত্রিশখানা গল্পের সিকোয়েল লেখা বাকি। এ বছর আমরা আর ছুটিতে কোথাও যাচ্ছি না। আসছে বছরও যেতে পারবো কিনা জানি না।